ইসলামিক আলো

আমাদের ঘরের মাঝের আগন্তুক

মূল বক্তব্য : ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল

প্রতিলিপি লিখেছেন রাবেয়া রাওশিন।

(**ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল** হকের আইসিডিতে পরিচালিত হালাকার একটি আলোচনার লিখিত রূপ এই লেখাটি। লেখাটিতে আলোচনাকে পাঠযোগ্য করার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে।)

আজ আমি আপনাদের প্রথমে এক পৃষ্ঠার একটা ছোট লেখা পড়ে শোনাব। লেখাটা নাম না জানা কোন বিদেশী লেখকের। অনুবাদ আমার। এই প্রবন্ধটার নাম হচ্ছে 'আগন্তুক'। এটা থেকেই আমরা আজকের মূল আলোচনায় যাব। এখানে লেখক বলছেন:

"আমার জন্মের কয়েক মাস আগে, আমার বাবার সাথে একজন আগন্তুকের দেখা হয়েছিল – যে আমাদের ছোট্ট শহরে তখন নতুন এসেছিল। শুরু থেকেই আমাদের বাবা ওই মুখর আগন্তুকের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট বোধ করেন এবং শীঘ্রই তাকে আমাদের সাথে এসে বসবাস করতে আমন্ত্রণ জানান। তার চেহারা বাহির থেকে দেখতে খুব আকর্ষণীয় মনে না হলেও সবাই তাকে খুব তাড়াতাড়ি আপন করে নিল এবং কয়েক মাস পর যখন পৃথিবীতে আমার আগমন ঘটল (অর্থাৎ ঐ লেখকের জন্ম হোল) তখন আর সবার সাথে, সেও আমাকে স্বাগত জানাল। আমি যখন বড় হচ্ছিলাম তখন বাড়িতে এই আগন্তুকের অবস্থান নিয়ে মনে কোন প্রশ্ন আসেনি। আমার কচি মনে পরিবারের সকল সদস্যের জন্য একেকটা আসন ছিল। আমার পাঁচ বছরের ছোট ভাই ইউসুফ ছিল আমার জন্য অনুসরণীয় উদাহরণ।" . .

এখানে একটা মুসলিম পরিবারের কথা বলা হচ্ছে।

. . "আমার ছোট বোন সাদিয়া আমার খেলার সাথী ছিল। সে আমাকে, নিজেকে বড় ভাই ভাবার যোগ্যতা দান করে ও মানুষকে ক্ষ্যাপানোর বিদ্যা অর্জনে সহায়তা করে। আমার বাবা- মা ছিলেন সম্পূরক, পরিপূরক শিক্ষক। মা আমাকে আল্লাহকে ভালোবাসতে শেখান আর বাবা শেখান কী করে আল্লাহর আনুগত্য করতে হয়। কিন্তু ওই আগন্তুক আমাদের গল্প শোনাত। সে অদ্ভুত সুন্দর সব হৃদয়গ্রাহী গল্প বানাতে ও শোনাতে পারত – অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য, কমেডি আরও কত কী! এসবই ছিল তার দৈনন্দিন সংলাপ। প্রতিদিন বিকালে সে আমাদের গোটা পরিবারকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার শ্রোতা হিসাবে ধরে রাখতে পারতো – আর সপ্তাহান্তে আমাদের জেগে থাকা সময়টুকুর প্রায় সবটুকু সে- ই নিয়ে নিতো। আমি যদি রাজনীতি, ইতিহাস বা বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু জানতে চাইতাম, সে তা জানাত। সে অতীত সম্পর্কে জানাত এবং মনে হতো বর্তমান সম্পর্কেও তার সম্যক জ্ঞান রয়েছে। সে এমন সব জীবন্ত ছবি আঁকতে পারত যে আমি প্রায়ই সেগুলো দেখে কাঁদতাম অথবা হাসতাম। সে আমাদের গোটা পরিবারের একজন বন্ধুর মতো ছিল। সে আমাকে, আমার বাবাকে ও ইউসুফকে আমাদের জীবনে দেখা প্রথম আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট ম্যাচে নিয়ে যায়। সে আমাদের সবসময় সিনেমা দেখতে উৎসাহ দিত। এমনকি বহু নামী- দামী মানুষের সাথে আমরা যেন পরিচিত হতে পারি, সে তারও ব্যবস্থা করে দিত। সে অনর্গল কথা বলতে পারত। আমার বাবা মনে হয় তাতে কিছু মনে করতেন না বা বিরক্ত হতেন না। কিন্তু আমরা বাকিরা যখন হাঁ করে তার বলা কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলের কথা শুনতাম, মা তখন মাঝে মাঝেই তার সভা থেকে উঠে যেতেন।

www.islamicalo.com

নিজের ঘরে গিয়ে তিনি কুরআন পড়তেন। কখনো তিনি সন্তর্পণে আমাদের বলতেন, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'ঈমানের সুন্দর দিক হচ্ছে সকল নিষ্ফল কাজ- কর্ম এড়িয়ে চলা'।"

আমরা হাদিস জানি, হয় উত্তম কথা বল নাহলে চুপ থাক; এর সাথে সকল নিষ্ফল কাজ এড়াতে বলেছেন আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

"এখন আমি মাঝে মাঝে ভাবি, মা কী কখনো এমন দু'আ করতেন যে, ওই আগন্তুক যেন চলে যায়? আমার বাবা আমাদের পরিবারকে কিছু নৈতিক নিয়ম- কানুনের ভিত্তিতে পরিচালিত করতেন। কিন্তু এই আগন্তুক সেগুলোকে সম্মান করার কোন প্রয়োজন বোধ করত না। এমনিতে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন আচরণ আমাদের বাড়িতে বরদাস্ত করা হতো না, আমাদের তরফ থেকে তো নয়ই, আমাদের বন্ধুদের বা বড়দের তরফ থেকেও ওই ধরণের কোন আচরণ বরদাস্ত করা হতো না। কিন্তু আমাদের অনেকদিনের অতিথি কখনো এমন চার অক্ষরের শব্দ ব্যবহার করত যাতে আমার কানে শীশা ঢালার অনুভূতি হতো এবং আমার বাবা তখন অস্বস্তিতে গজগজ করতেন। তবে আমার জানামতে এই আগন্তুককে কখনো চ্যালেঞ্জ করা হয়নি।"

চার অক্ষরের শব্দ আমি এখানে বললাম না, ইংরেজীতে যাদের জ্ঞান আছে তারা বুঝতেই পারছেন কোন অশ্লীল শব্দ এটা।

"আমার বাবা কখনোই মদ স্পর্শ করেননি এবং কখনো বাড়িতে অ্যালকোহল অনুমোদন করেননি। এমনকি রান্নার জন্যও নয়।"
আগেই বলেছি এটা একটা বিদেশী লেখা, আমার কাছে এসেছে একজন শ্রীলংকান মুসলিমের তরফ থেকে।

"কিন্তু ওই আগন্তুক যেন মনে করত যে, আমাদের অন্য ধারার জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। সে আমাদের প্রায়ই বিয়ার ও অন্যান্য মদজাতীয় পানীয় সাধত। সে আমাদের বোঝাত সিগারেট বেশ মজার একটা জিনিস, চুরুট বেশ পুরুষালী আর পাইপ হচ্ছে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। সে খোলামেলাভাবে যৌনতা নিয়ে কথা বলত। তার মতামতগুলো ছিল চাঁছাছোলা, কখনো ইঙ্গিতবহ আর প্রায়শই বিব্রতকর। কিভাবে রসিয়ে রসিয়ে মেয়েদের সাথে আলাপ জমান যায় তাও সে আমাদের শিখিয়ে দিত। আমি এখন বুঝতে পারি, নারীপুরুষের সম্পর্কের ব্যপারে আমার মনে প্রোথিত প্রাথমিক ধারণাগুলো তার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এখন যখন আমি পেছনে ফিরে তাকাই, তখন আমার মনে হয় যে, এটা আমাদের জন্য আল্লাহর এক বিশেষ রহমতের ব্যপার ছিল যে ওই আগন্তুক আমাদের আরও বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি। বারবার সে আমার বাবা- মার শেখান নৈতিক মূল্যবোধের বিরোধিতা করত। তথাপি তাকে কদাচিৎ শাসন করা হতো বা চলে যেতে বলা হতো।"

অর্থাৎ, তাকে কখনোই শাসন করা হতো না বা চলে যেতে বলা হতো না।

"যখন থেকে সে আমাদের পরিবারের সাথে বসবাস শুরু করেছিল, তারপর প্রায় তিরিশ বছর পেরিয়ে গেছে। এখন অবশ্য আমার বাবার কাছে সে তার আগমনের পরের প্রথম দিককার দিনগুলোর মতো প্রিয় নয়। কিন্তু তবুও এখনো আমি যদি কখনো আমার বাবা- মায়ের শোবার ঘরে প্রবেশ করি, তবে দেখি সে এক কোণায় বসে রয়েছে – কখন কেউ তার কথা শুনবে বা তার আঁকা ছবি দেখবে বা সে তার যাদু দিয়ে শ্রোতাদর্শককে বিমোহিত করবে সে অপেক্ষায়। আপনারা হয়ত তার নাম জানতে চাইবেন, আমরা তাকে টেলিভিশন বলে ডাকি।"

ইসলামিক আলো

পুরো লেখাটা ছিল এই। আজকে আমাদের আলোচনাটাও আমাদের বাসার টেলিভিশন নিয়ে। যে জিনিসগুলো আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের নিষেধ করি, সে জিনিসগুলো নাটক- সিনেমায় দেখানো হয়। বিয়ার, মদের বিজ্ঞাপন দেখেন নিশ্চয়ই আপনারা? ই.এস.পি.এন.- এ ক্রিকেট দেখার সময় সাথে দেখেন না এগুলো? বাবা- ছেলে- মেয়ে বসে একসাথে দেখেন। আরও ইঙ্গিতপূর্ণ জিনিসও দেখেন। এখানে যা যা বলেছে তার একটা কথাও মিথ্যা না। এবং সে (টিভি) যখন এগুলো বলে, আমরা সবাই পাশাপাশিই বসে থাকি – একটু বিব্রত বোধ করি, কিন্তু হজম করে নেই। সে আমাদের সমস্ত ইসলাম বিরোধী, নৈতিকতা বিরোধী জিনিস বলে যায় এবং আমরা হজম করে নেই। আজকাল পেপারে দেখি: যে সমস্ত খুন হচ্ছে, (আমাদের বাসায় আলহামদুলিল্লাহ্ বার বছর টিভি নেই – তাই আমি দেখি না, কিন্তু) এগুলো নাকি সমকালীন সিরিয়ালগুলোর উপজীব্য! বাংলাদেশের পেপার খুললে কে কার স্বামী বা স্ত্রীকে মারলো, পরকীয়া প্রেম এগুলোই দেখা যায় – এটাই বলা হয়েছে এই লেখায়। আসুন, আমরা এখন আমাদের মূল আলোচনায় যাই।

আমরা "STRANGER IN OUR HOMES: TV AND OUR CHILDREN'S MIND" বইটা নিয়ে একটু কথা বলব। বইটার ভূমিকা ও সমাপ্তি লিখেছেন ইসলামের একজন পশ্চিমা 'আলিম। উনি মালিকি মাযহাবের জোরালো সমর্থক ও সুফীবাদের প্রতি কিছুটা ঝোঁক আছে তার। আমি তার আক্বীদা- মানহায গ্রহণ না করলেও, সামাজিক ব্যপারগুলোতে তার কথাগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী বলে মনে করি। তার নাম: **হামযা ইউসুফ হ্যানসন**। ক্যালিফোর্নিয়াতে "যায়তুনা" বলে একটা মাদ্রাসা আছে তার। এই বইটা যায়তুনা ইন্সটিটিউট থেকে ২০০০ সালে বের করা হয়েছে। বইটার সামনে পিছনে তার লেখা আছে, কিন্তু মূল বক্তব্যটা **সুজান আর. জনসন** বলে একজন মহিলার। তিনি ডক্টর অফ মেডিসিন(MD) , এসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল প্রফেসর অফ পেডিয়্যাট্রিক্স, ডিভিশন অফ বিহেভিয়রাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পেডিয়্যাট্রিক্স। আমরা আজকে এই বইয়ে সংযুক্ত তার একটা লেখা নিয়ে কথা বলব, যা ১৯৯৯ সনের জানুয়ারির ৫ তারিখে সানফ্রানসিসকোতে তিনি একটা বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছিলেন।
তিনি শিশুদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে, স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে, কেন তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ নাই, কেন কিছু জিনিস শিখছে, কিছু জিনিস শিখছে না – এসব বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তিনি প্রথমে বলছেন যে, মা হওয়ার আগে পর্যন্ত বিষয়টা তিনি সেভাবে বুঝতে পারেন নি। তিনি এক জায়গায় সাত বছর চাকরি করেছেন এবং আট থেকে বার বছর বয়সী যেসব বাচ্চাদের শিখতে অসুবিধা হয়, তাদের নিয়ে গবেষণা করেছেন – শত শত বাচ্চাদের দেখেছেন, যারা মনোযোগ দেয় না বা পাঠ্য বিষয়গুলো ঠিকমত ধরতে পারে না; কিন্তু যেসব কাজে শারীরিক অঙ্গভঙ্গির প্রয়োজন হয়, যেমন ছবি আঁকা, লেখালেখি বা জ্যামিতিক আকৃতি নিয়ে খেলা – এসবে তারা ভালো করছে। আবার অনেক বাচ্চাই অন্যদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না।

শিশু চিকিৎসক হিসাবে তিনি সবসময় টেলিভিশন দেখাকে নিরুৎসাহিত করেছেন, কারণ এটা অনেক সময় হিংস্র জিনিস প্রচার করে। বাচ্চাদের কার্টুনে অনেক সময় নানা ধরনের জোরালো শব্দ থাকে, 'বুম', 'ব্যাঙ' ইত্যাদি। এমনকি আমরা যখন টম অ্যান্ড জেরি দেখতাম, সেখানেও 'দুম- দুম- দুম- দুম' করে পিটানোর শব্দ থাকত। আমরা মনে করি এটা তো বিনোদন, এগুলো তো সত্যি কিছু না – কিন্তু বাচ্চাদের মাথায় এই জিনিসগুলো ঢুকে যায়। এমনকি বিজ্ঞাপনেও যা দেখান হতো, সেগুলো নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন যে, ওগুলো ক্ষতিকর, ওগুলো এড়িয়ে চলা উচিৎ। তার নিজের বাচ্চা জন্মানোর আগেও, এসব নিয়ে এধরনের তিনি চিন্তাভাবনা করতেন।

কিন্তু নিজের বাচ্চা হওয়ার পর, আস্তে আস্তে বুঝলেন যে, টিভিতে যা- ই দেখান হোক না কেন তা- ই আসলে বাচ্চাদের জন্য ক্ষতিকর – এমনকি যদি জীব- জন্তু, গাছ- পালা দেখান হয় তাহলেও। আমরা অনেক সময় মনে করি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বা ডিসকভারি চ্যানেল মনে হয় খুব উন্নতমানের প্রচার মাধ্যম – কিন্তু আসলে ব্যপারটা তা না। তার বাচ্চা হওয়ার পর টিভির আসল ক্ষতিটা কোথায়, সেটা তিনি বুঝতে শুরু করলেন। কী দেখান হচ্ছে সেটা মূল ব্যাপার ছিল না,

www.islamicalo.com

কারণ, তিনি সচেতনভাবে সমস্ত মারামারি- হানাহানি- অশ্লীলতা বাদ দিতেন! কিন্তু তারপরও দেখলেন যে, তার বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল সেটা দেখব আমরা।

আমরা অনেকেই এখন বাচ্চাদের "টিভি" ঘুষ দিয়ে থাকি। আজকাল অনেক পরিবারেই স্বামী- স্ত্রী দুজনেই চাকরি করেন। বাচ্চাদের জন্য তাদের সময় নাই। বেশী টাকার বা বড় মাইনের চাকরির প্রয়োজন – মৌলিক চাহিদা মেটাতে নয়, বরং মূলত দামী দামী "জিনিস" বা "আসবাবপত্র" সংগ্রহ করতেই দুজনের চাকুরী করা প্রয়োজন। আপনাকে যে সময়টাতে বাচ্চারা "মিস" করছে, ওই সময়টা আপনি ঘরে, টিভির সামনে, বসিয়ে রাখছেন তাদের।

আমাদের দেশ সাদা সাহেবরা শাসন করে গেছে, কিন্তু আমরা অনেক রক্ষণশীল ছিলাম। একটা মুসলিম পরিবারের শোবার ঘরে কখনো তারা ঢুকতে পারেনি, এমনকি আমাদের বাড়িতেও কখনো ঢুকতে পারেনি। আমরা বলি, মুসলিম পরিবার হচ্ছে আপনার দুর্গ, এটা সবার জন্য উন্মুক্ত না। তারা কখনো আমাদের স্ত্রীদের সামনে আসেনি। আজকে কী হচ্ছে, শোবার ঘরে টেলিভিশনের পর্দায় একজন সাদাচামড়ার সাহেব গান গাচ্ছে – আপনার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতবহ গান – আপনার স্ত্রী দেখছেন না? আমরা কোথায় নিয়ে এসেছি তাদের কথাকে, সংস্কৃতিকে!

শিশুবিশেষজ্ঞ সুজান বলছেন, *কী দেখান হচ্ছে সেটা কোন ব্যাপার না। টিভির মাধ্যমে তার বাচ্চার আচরণ পরিবর্তন হয়ে গেল।* আপনারা দেখবেন, বাচ্চারা যখন টিভি দেখে, তখন তারা কিন্তু আপনার সাথে ভালোভাবে কথা বলবে না; অর্ধেক মনোযোগ দিয়ে সে আপনাকে শুনছে, তার চোখ- কানের অর্ধেক ওইদিকে। সে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে, দাঁড়িয়েও শুনছে না আপনার কথা। তার আচরণ পাল্টে যাচ্ছে। টিভি দেখার আগে, দেখার সময় ও পরে তার মানসিক ও শারীরিক নড়াচড়া পাল্টে যাচ্ছে। তিনি কিন্তু অমুসলিম মহিলা – সাধারণ পর্যবেক্ষণের কথা বলছেন – সব অবস্থাতেই তার বাচ্চার আচরণ পাল্টে গেছে, যা দেখে আসলে তিনি রীতিমত 'ভয়' পেয়েছেন।

তারপর উনি বলছেন, *যখন বাচ্চা টিভি দেখত না তখন সে প্রকৃতির মাঝে থাকত, পোকামাকড়ের প্রতি কৌতুহল প্রকাশ করত।* গ্রামে গেলে দেখবেন আমাদের এদেশীয় বাচ্চারা জোনাকি পোকা নিয়ে কি করে – ধরবে, ধরে গ্লাসের ভেতর ঢুকাবে, দেখবে কতক্ষণ জ্বলে! তো, তার বাচ্চাও প্রকৃতির সাথে বড় হচ্ছিল। আমরাও তো ছোটবেলায় বালু দিয়ে, পানি দিয়ে খেলতাম, দুর্গ বানাতাম। তারপর সুজান বলছেন, তার বাচ্চা প্রকৃতির মাঝে শান্তিতে ছিল – নিজেকে নিয়ে, নিজের শরীর নিয়ে, তার পারিপার্শ্বিকতাকে নিয়ে। যদি আপনি দেখেন একটা বাচ্চা প্রকৃতির মাঝে খেলছে, দেখবেন সে আনমনে অনেক কিছু করে যাচ্ছে। আমাদের মায়েরা ছয় ছয়টা বাচ্চা প্রতিপালন করেছেন, কোথায় অত সময় দিতে পেরেছেন তারা? এখন তো ওয়াশিং মেশিন, ডিশ ওয়াশার, ব্লেন্ডার আছে। তখন তো ওসব ছিল না। আমাদের মায়েরা আমাদের প্রতিপালন করেছেন কী করে? আমরা প্রকৃতির মাঝে বড় হয়েছি। কিন্তু আজকে আমাদের বাচ্চারা খোপের ভেতর বড় হচ্ছে এবং তাদের আচরণ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন চাইলেই শহর ভেঙ্গে গ্রাম বানিয়ে ফেলতে পারব না। কিন্তু আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল যেভাবে ছেলেমেয়েদের বড় করতে বলেছেন, তার সাথে কিন্তু সুজানের উৎকন্ঠা ও চাওয়াগুলো মিলে যায় – তিনি খুব ইসলামিক একটা কথা বলেছেন না জেনেই।

তারপর তিনি বলছেন, *যখন তার বাচ্চা টিভি দেখতে শুরু করল, সে তার প্রতি খুবই অমনোযোগী হয়ে গেল। উনি ডাকছেন অথচ বাচ্চার কোন সাড়া নেই। চোখটা আঠার মতো লেগে আছে টিভিতে। সে তার চারপাশের পরিবেশের প্রতিও অমনোযোগী হয়ে গেল।* ঘরে একজন মেহমান এলো – তার কথা বলার সময় নাই, তাকানোরও সময় নাই। আমাদের ছোটবেলায় ঘরে আপন মামা, চাচা আসলে আমরাই চা, শরবত নিয়ে গেছি; কাজের মানুষ না। এগুলোর সময় নেই তার। এখন আমাদের আরও যেটা হয়, ছোট বাচ্চাদের খাওয়ানোর উপায় হচ্ছে টিভি, ওদিকে তাকিয়ে বিজ্ঞাপন দেখছে আর গিলছে। খাবারের দিকে তার কোন মনোযোগ নাই, খাবার সে চাবাচ্ছে না; তার তো পেট খারাপ হবেই! কারণ আমাদের খাওয়াটা গন্ধ, স্পর্শ, রংসহ দেখতে যা লাগে – তা থেকে আমাদের মুখে পানি আসে, লালা আসে, ইচ্ছা জাগে খাওয়ার। আমরা চিবাই আর খাবারটা সহজে হজম হয়। কিন্তু টিভির দিকে তাকিয়ে ওভাবে গিললে,

খাবার হজম হয় না। বাচ্চারা অপুষ্টিতে ভোগে; দাঁত ওঠে না, চোখে দেখে না – কতরকম সমস্যা হচ্ছে না এখন? এগুলো কিন্তু অনেক কারণে হয়, এসব চিন্তা করার ব্যপার। মুসলিমরা চিন্তা করবে – আল্লাহ তাদের কেন জন্ম দিলেন, কী কারণে, কোনটা করলে সবচেয়ে ভালো হয় ইত্যাদি।

তারপর উনি বলছেন, *আমি যখন টিভি বন্ধ করে দিতাম, সে বিরক্ত হত, ঘ্যানঘ্যান করত, কখনো চিৎকার করত, কখনোকাঁদতো – টিভিটা আবার ছেড়ে দেয়ার জন্য। তার খেলাধুলাগুলো অগোছালো হয়ে যাচ্ছিল, কোন নিয়মের ধার ধারত নাসে। তার নড়াচড়াও ঠিক ছিল না – বাচ্চাদের যেমন স্বাভাবিক হওয়ার কথা তেমন ছিল না। তার খেলায় নিজস্ব কল্পনা থাকত না।* বিদেশীদেরও কিন্তু দেখবেন – আল্লাহ ওদের অনেক জায়গাজমি দিয়েছেন – তারা কল্পনাশক্তি ব্যবহার করত খেলাধুলায়, গাছের ওপর ঘর বানাত ইত্যাদি। এই যে নিজের চিন্তা থেকে কিছু করা – এগুলোর কোন আগ্রহ রইলো না সুজানের বাচ্চার, যখন সে টিভি দেখতে শুরু করল। সে নিজে থেকে কিছু না করে টিভিতে যা দেখছে, ঠিক তার মতো করেই একটা কিছু করার চেষ্টা করছে।

এরপর উনি আট থেকে এগার বছরের ছয়টা বাচ্চাকে নিয়ে গবেষণা করলেন। আমরাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এক থেকে এগার/বার বছরের মধ্যে বাচ্চাদের মাথায় যেটা ঢুকে, সেটা বের করা যায় না। এই সময়টা আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের বাচ্চাদের যত্ন নিজে নেবেন, তাকে দ্বীন শেখাবেন, আল্লাহর কথা শোনাবেন, নবীর গল্প শোনাবেন, ইসলামের ইতিহাস শোনাবেন – আল্লাহর ওয়াস্তে কুফফার, নাসারা, ইহুদীদের জিনিসপত্র তাদের কাছে উন্মোচিত করবেন না। কারণ এই সময় যা শিখবে, তা মাথা থেকে বের হবে না। আমার মনে আছে ওই রকম বয়সে আমার স্কুলের টিচার একটা কথা বলেছিলেন যা প্রকারান্তরে বোঝায় বিজ্ঞান ঠিক, কুরআন ভুল। অথচ উনি যা বলেছিলেন, তা কুরআনে কোথাও লেখা নেই। আমার মনে আছে আমার কেমন লেগেছিল তখন, আমার কিশোর মন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে কী হয়? আল্লাহ, আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে মনে হীনমন্যতা জন্মায়, পরবর্তীতে আমরা কিন্তু আর ইসলামকে শ্রদ্ধা করতে পারব না। আমাদের কাছে কুফফার, নাসারা, ইহুদীদের জিনিসই প্রাধান্য পাবে। এ জন্য এই বয়সটা খুব যত্ন নেবেন বাচ্চাদের, তাদের সময় দেবেন, টিভির মতো আবর্জনা থেকে দূরে রাখবেন – ইসলামের বা সাধারণ সুন্দর সুন্দর গল্প বলবেন, টিভি বা কার্টুনের ঘুষ দিয়ে বসিয়ে রাখবেন না।

যাই হোক, তার গবেষণার বাচ্চাদের ব্যপারে উনি বলছেন, *কোন শব্দ বা অক্ষর বলা হলে তারা সেটার মানসিক আকৃতি দিতে পারত না।* এই জিনিসটা ব্যখ্যা করি, কল্পনার ভেতর কোন জিনিস দেখা। যেমন, যারা গাড়ি চালায়, যদি একটা ম্যাপ উল্টা থাকে আপনি মনে মনে ম্যাপটাকে সোজা করে পথটা বুঝে নিবেন। একে বলে স্প্যাশিয়াল অ্যাবিলিটি (SPATI AL ABI LI TY) । এটা মস্তিষ্কে গড়ে তুলতে হয়। মনের এই কল্পনাশক্তিটা জন্ম না নিলে এই দক্ষতাটা আসবে না। আর এটা আসবে না, যদি কেউ হাঁ করে বসে থেকে সারাদিন টিভি দেখে। যার এই দক্ষতা যত বেশি সে তত ভালো ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাথমেটিশিয়ান হতে পারবে। এরপর উনি বলছেন, যদি তিনি তাদের কয়েকটা অক্ষর দেখিয়ে একটা বের করতে বলতেন, তাহলে তারা সেটা পারত; কিন্তু না দেখালে তারা আর পারছে না। এই সকল বাচ্চারাই অনেক টিভি, ভিডিও দেখত আর কম্পিউটার গেম খেলত – কেন পারেনি তার মূল কারণ হচ্ছে এসব। আপনি মনে করবেন না কম্পিউটার গেম নিরাপদ, তা না কিন্তু! অনেক 'ঢিসুম- ঢাসুম' আছে। তখন উনি চিন্তা করতে শুরু করলেন টিভির সামনে বাচ্চাদের রাখলে কী সমস্যা হয় তাদের? সমস্যাটা হচ্ছে, মস্তিষ্কের জন্য আর করার কিছু থাকে না, এর চিন্তা- ভাবনা করার, কাজ করার কিছু নাই। জানেন তো, মানুষের বাচ্চাকে দশ- বিশ বছর কোন কাজ করতে না দিলে, চেয়ারে বেঁধে রেখে দিলে সে কিন্তু আর দাঁড়াতেও পারবে না, হাঁটতে পারবে না – আল্লাহ মানুষকে এভাবেই বানিয়েছেন। গরু- ছাগলের বাচ্চা জন্মগতভাবেই ডাক দিতে, হাঁটতে, দৌড়াতে পারে কিন্তু মানুষের বাচ্চাকে শেখাতে হয়। এই কারণে বলছেন, মানুষের বাচ্চা যখন টিভি দেখে, তখন সবকিছু তার মাথার ভেতরে ঢুকছে, সে নিজে চিন্তা করে কিছু বের করে না।

এরপর উনি বলছেন, *শিশুদের দেখা, শোনা, স্বাদ নেয়া, গন্ধ নেয়া, স্পর্শ করা এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটা কাজে লাগে এমন ব্যপারে নিয়োজিত করতে হবে।* এখানে আমি আমার নিজের জীবনের একটা গল্প বলি: আমার মেয়ে যখন ছোট ছিল, তখন শীতকালে একবার সে আম খেতে চাইল। তার মা বলল এখন তো আম পাওয়া যাবে না। সে বলে উঠল, দোকানে গেলে পাওয়া যাবে না? এখন, এই বিষয়টা আসলে কী? তার মাথায় আছে পয়সা দিলে দোকানে সব পাওয়া যায়। একে আমরা বলি "ইনস্ট্যান্ট গ্রাটিফিকেশন", অর্থাৎ আমার এক্ষুণি দরকার, এক্ষুণি চাই, তুমি যেখান থেকে পার এনে দাও। এটা কিন্তু চরিত্রটাকে নষ্ট করে দেয়। সে সবকিছু রেডিমেড পেতে, দেখতে ও কিনতে শেখে। অপরদিকে, সে যদি প্রকৃতির মাঝে থাকত তাহলে কী দেখত? প্রথমে দেখত আমের মুকুল আসছে, তারপর দেখত কিছু ঝরে গেছে আর কিছু রইল, তারপর আমের গুটি আসছে, সেখান থেকেও কিছু ঝরে গেল, এরপর কিছু কাঁচা আম এলো, তারপর বৈশাখের ঝড়ে কিছু ঝরে গেল কিছু রইল, যা টিকল সেটা পাকল, পাকার পর সেটা পাড়া হোল ও সবাই ভাগ করে খেলো। এর মাঝে কী নিহিত আছে? ইসলামের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় জিনিসটা – সবর বা ধৈর্য! আজকাল দেখবেন আমাদের সবর নাই কারণ আমরা মনে করি পয়সা দিলেই তো সব পাওয়া যায়। আমরা একটা ধৈর্যহীন প্রজন্ম হয়ে যাচ্ছি। পড়াশোনা করব তারপর ভালো রেজাল্ট হবে, তার চেয়ে নকল করলেই তো হয়ে যায়! এসবই কিন্তু "ইনস্ট্যান্ট গ্রাটিফিকেশনের" বা "তৎক্ষনাৎ তৃপ্তি" লাভের প্রবণতার ফল। আগে টিভিতে একটা বিজ্ঞাপন ছিল, "কোকোলা লজেন্স এক্ষুনি আনো"! এই কথাটা কিন্তু খুবই ইসলাম বিরোধী! কেন? আমাদের আল্লাহ কী বলেছেন? এই দুনিয়ায় সবকিছু পাবে না, দুনিয়া থেকে আমরা ততটুকু নিব, যতটুকু বাঁচার জন্য দরকার। সমস্ত প্রতিজ্ঞা আখিরাতের জন্য। এখন ধৈর্য ধরবেন, পরবর্তীতে পাবেন – এটা হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। আল্লাহ আপনাকে যা এখানে নিষেধ করছেন, সেটা কিন্তু বলছেন জান্নাতে পাওয়া যাবে। দুনিয়া হচ্ছে ধৈর্যের ব্যপার, অপেক্ষা করার ব্যপার, "ইনস্ট্যান্ট গ্রাটিফিকেশনের" উল্টা জিনিস এটা।

এরপর লেখিকা বলছেন, *বাচ্চাদের ইন্দ্রিয়গুলো স্পঞ্জের মতো হয়; যা দেখবে তাই শুষে নেয় এবং তাদের কোন একটাইন্দ্রিয়কে বেশি উত্তেজিত করলে, অন্যগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। যদি শুধু চোখ আর কান এক জায়গায় আটকে দেয়া হয় তাহলে বাকিগুলো ব্যবহৃত না হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।* সবকয়টা ইন্দ্রিয়ের দরকার আছে; সে প্রকৃতির কাছে যাবে, একটা কিছু ধরবে, একটা পিঁপড়া কামড় দেবে – এর দরকার আছে। একটা ফুলের ঘ্রাণ সুন্দর আরেকটার বাজে, এর দরকার আছে; একটা জিনিসের স্বাদ ভালো আর একটার স্বাদ কষটা, এর দরকার আছে। প্রত্যেকটা অভিজ্ঞতার দরকার আছে। বাচ্চা বড় হবে ও সেই সাথে তার সব ইন্দ্রিয়গুলো গড়ে উঠবে – এটাই বলছেন তিনি। এরপর লেখিকা বলছেন, ছোটবেলায় সবকিছুই সে গ্রহণ করবে, এর মাঝে বাছবিচার করতে শিখবে না সে। শব্দের ব্যপারটাই ধরুন, প্রচন্ড সশব্দ মিউজিকে আপনি পাশের বাসায় বসে টিকতে পারছেন না, কিন্তু একটা বাচ্চা তার মাঝেই বসে আছে! এর মানে কী? সে এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, এখন আর স্বাভাবিক শব্দের মাত্রা তার ভালো লাগবে না। আর, স্পর্শের ইন্দ্রিয়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মা ও মাটি এই দুটা ছাড়া কোন বাচ্চা প্রাকৃতিকভাবে বড় হতেই পারে না। এই মহিলা বিধর্মী তাও বলছেন, মানুষ হওয়ার জন্য মায়ের স্পর্শে থাকতে হবে। মাটি ধরবে, মলিন হবে এবং মায়ের কাছে থাকবে – এসবকিছুই খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যপার।

এরপর আমরা লেখা শেষের প্রশ্নোত্তর পর্বটা একটু দেখবো। টিভি দেখার ফলে মনের উপর কি ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে? টিভি দেখার কারণে যখন আপনি মনকে একখানে আটকে ফেলেন, তখন আপনি অন্য অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হন – যা মস্তিষ্কের বেড়ে ওঠাকে বাধাগ্রস্ত করবে। একটা বাচ্চার সাথে যদি কথা বলা না হয়, খেলা না হয়, তাকে স্পর্শ করা না হয় তাহলে তার মস্তিষ্কের আকার ২০-৩০% ছোট হয়ে যায়। ছোঁবেন কখন, আপনি তো অফিসে! আপনার স্ত্রীও অফিসে। কথা বলারও সময় নেই। টেলিভিশনের কথা না, আপনার নিজের কথা বলার কথা বলছি আমরা। প্রাণীর ওপর গবেষণায় দেখা গেছে, একটা প্রাণীকে আটকে রেখে যদি অন্য প্রাণীদের খেলা দেখতে দেয়া হয় – টিভির মতো যেখানে আপনার নিজের নড়াচড়া নাই কিন্তু আপনি নড়াচড়া দেখছেন – তাহলে দেখা গেছে, প্রাণীটা যত বেশি দেখেছে, তত বেশি তার

মস্তিষ্কের আকার কমে যাচ্ছে। এরপর ব্যাপারটা টিভির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দেখা যাবে, টিভি শুধু দুইটা ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে – দেখা আর শোনা। এতে করে আপনার চিন্তাশক্তি কমে যাচ্ছে, মস্তিষ্কের আকার ছোট হয়ে যাচ্ছে, কল্পনাশক্তি কমে যাচ্ছে – আপনি লিখতে- পড়তে পারবেন না, আপনার কোন মনোযোগ থাকবে না!

এখানে একজন জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আমরা কী করতে পারি? শিশুচিকিৎসক সুজান পরামর্শ দিলেন,

১। যতটা সম্ভব টিভি বন্ধ করে রাখুন।

এটা খুবই সাধারণ কথা। আমাদের বাসায় বারো বছর টিভি চলে না। বাসায় দুইটা বাচ্চা আছে, একজন এগার বছর অন্যজন আট, জীবনে কোনদিন টিভি দেখেনি তারা। তাদের মস্তিষ্কের গ্রহণক্ষমতা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না – বড়টা নিজে নিজে কুরআন দেখতে দেখতে পড়তে শিখেছে। আসহাবে রাসূলের কাহিনী, ইবন কাসীর তার পড়া শেষ। কেন? তার তো "ইনপুট" দরকার! তার মস্তিষ্ক কিন্তু খালি! এবং তার কত প্রশ্ন – জীবন নিয়ে, প্রকৃতি নিয়ে, বিজ্ঞান নিয়ে! টেলিভিশন দেখা বাচ্চারা কিন্তু কোন প্রশ্ন করবে না। তার প্রশ্ন করার কিছু নাই, ওখানেই সে সব দেখছে।

২। বাচ্চাদের বই পড়ে শোনাবেন – যেটা আমাদের মায়েরা, খালারা বা বড় ভাই- বোনেরা করেছে – বিশেষ করে ছবি ছাড়া বই।

আজকাল দেখবেন পুরো বইজুড়ে শুধু ছবি, এক লাইন লেখা। উনি কিন্তু উল্টা বলছেন, পুরোটা লেখা, একটু হয়ত ছবি থাকতে পারে। এতে কী হবে? সে কল্পনা করতে শিখবে। মুসলিম পরিবারে ছবি ছাড়া গল্প বলা নিয়ে কোন সমস্যা নেই। আমরা যখন নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) গল্প বলি আমরা কি ছবি দেখাই? আর প্রচুর গল্প বলবেন। ইনশাল্লাহ আমরা যারা মুসলিম আমরা নবী- রাসূলের গল্প, সাহাবীদের গল্প, কুরআন- হাদীসের গল্প বলব। আজকাল অনেক সাহিত্য আছে যেখান থেকে আমরা পড়তে পারি।

৩। প্রকৃতি! প্রকৃতি! প্রকৃতি!

যার যতটুকু সময় ও সুযোগ আল্লাহ দিয়েছেন, প্রকৃতির কাছে বাচ্চাদের নিয়ে যাবেন। যতবার সম্ভব। প্রতিটি সম্ভাব্য ছুটিতে। এমনকি প্রতি সপ্তাহ শেষে যদি পারেন – ঘাস, মাটি, পোকা, বালু, কাদার ভেতর নিয়ে যাবেন। ধৈর্যের সবচেয়ে বড় শিক্ষক হচ্ছে প্রকৃতি। একটা গাছ পুঁতল, পানি দিল কিন্তু গাছটা মরে গেল। গাছ মরতেই পারে। শিক্ষা না এটা? আমার একটা ছোট ভাই ছিল, আব্বা- আম্মার অনেক আদরের কিন্তু মারা গেছে। মরতে পারে না? প্রকৃতি আপনাকে ধৈর্য শিখাবে। আপনি ধাক্কা খাবেন না। বুঝবেন যে সবকিছু ধীরে ধীরে হয়। "ইনস্ট্যান্ট গ্রাটিফিকেশনের" উল্টা জিনিস হচ্ছে "ডিলেইড গ্রাটিফিকেশন" (বিলম্বে তৃপ্তি)। এর উদাহরণ কী? রোজা! সারাদিন অপেক্ষার শেষে পানি খেতে পারবেন। প্রকৃতি আপনাকে এই শিক্ষা দিবে। মানুষের চরিত্রে এটা গড়ে তোলা দরকার। "নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য থাক" – এটা কাফেরের দর্শন। আর ইসলামের মূল শিক্ষায় রয়েছে পরীক্ষা শেষের ফলাফল – কষ্ট করে ক্ষেতে বীজ বুনে, ফসলের জন্য যেমন আপেক্ষা করতে হয়। নগদ তেমন কিছুই পাবার নেই যেন, যতটুকু দরকার সেটুকু গ্রহণ করে আল্লাহ- নির্ধারিত নিয়মে ও আল্লাহর আনুগত্যে জীবন কাটাতে পারলে, আপনার জন্য রয়েছে জান্নাত। আল্লাহর রাসূলের ওই হাদীস, সমুদ্রের পানিতে আঙ্গুল ডুবিয়ে নিয়ে আসলে যা আঙ্গুলে লেগে থাকে সেটুকু দুনিয়ার জীবন। আর সমুদ্রে যেটুকু পানি রয়ে গেল, তা হোল আখিরাতের অনন্ত জীবন। তাহলে একজন মুসলিম কোন অবস্থায় এই দুনিয়ার জন্য আখিরাতকে নষ্ট করবে না। বরং, আখিরাতে প্রাপ্তির জন্য সে এখানে ধৈর্যধারণ করবে। সে এখানে ত্যাগ করবে, কষ্ট করবে, চোখমুখ বুঁজে থাকবে, সহ্য করে যাবে অনেক কিছু।

এরপর লেখিকা সুজান বলছেন, প্রকৃতি হচ্ছে পর্যবেক্ষণের বড় শিক্ষক। এর রঙগুলো দেখার মতো – আর তা সবগুলো ইন্দ্রিয়কে উজ্জীবিত করে তোলে। একটা ফুল- ফোটা সর্ষেক্ষেত আর কিছু দিয়ে বর্ণনা করা যায়? এরপর উনি বলছেন, আজ অনেক বাচ্চা আছে যারা প্রকৃতির কাছে যেতে আগ্রহ পায় না, বলে 'তোমরা যাও আমি এখানে বসে কার্টুন দেখি বা গেম খেলি।' আছে না এমন? নড়তে চায় না। মুরগী (ফ্রাইড চিকেন) খেতে খেতে এরা মোটা হয়ে গেছে। ফাস্টফুড কিন্তু "ইনস্ট্যান্ট গ্রাটিফিকেশন", মানে রান্নার জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন নেই – সেই ধৈর্যও নেই। এক্ষুণি দরকার আমার – সুতরাং পয়সা দিয়ে ফাস্টফুডের দোকান থেকে মুহূর্তে কিনে নিয়ে আসতে চাই!

যাহোক, *উনি বলছেন অনেকসময় যারা টিভি দেখে, প্রকৃতিকে তাদের বোরিং মনে হয় কারণ তারা টিভির দ্রুতলয়ের অ্যাকশনে খুবই অভ্যস্ত হয়ে যায়।* 'টুং- টুং', 'ব্যাঙ', 'দুম- দুম' গুলি ইত্যাদি শব্দ আছে না? এর বিপরীতে প্রকৃতিকে তাদের নীরব, অ্যাকশনবিহীন মনে হয়। প্রকৃতিতে যে কোন জিনিস কিন্তু ধীর, শান্ত, শান্তিপূর্ণ। সেখানে একটার পর একটা ঘটনা ধীরে ধীরে ঘটে, প্রকৃতির কর্মকান্ডের প্রত্যাশায় ধৈর্যের ব্যপার রয়েছে।

৪। আপনার নিজের ও বাচ্চার ইন্দ্রিয়ের প্রতি মনোযোগ দিন।

মাঝে মাঝে বাচ্চাদের এক চোখ বন্ধ করে অন্য চোখে দেখতে পায় কি না জিজ্ঞেস করবেন। এমন কিন্তু হয় যে একটা বাচ্চা এক চোখে দেখে না অনেকদিন – অথচ বাবা- মা জানেই না, কারণ সে অ্যাডজাস্ট করে নেয়। তাকে জিজ্ঞেস করবেন কোনটা কী রঙ বোঝার জন্য যে সে "কালার ব্লাইন্ড" কি না। সে সবরকম স্বাদ, গন্ধ চিনতে পারে কি না – অনেক মানুষ আছে সব ধরনের স্বাদ, গন্ধ পায় না। এগুলো নিজেরটা ও বাচ্চারটা পরীক্ষা করে দেখবেন।

৫। শিশুদের হাত, পা ও পুরো শরীর ব্যবহার করে অর্থবহ কাজ করতে দিন।

খেয়াল করবেন সে হাত, পা, সম্পূর্ণ শরীর ব্যবহার করছে কি না। তাকে মাঠে ঘাটে ছেড়ে দিন, ও দৌড়াক, আছাড় খাক, হাত- পা ছিলুক – এগুলো সব প্রয়োজনীয়!

এই ছিল শিশু বিশেষজ্ঞ সুজানের ৫টা পরামর্শ।

এরপর আমরা হামযা ইউসুফের লেখার অংশ দেখব। উনি ছয় বছর মৌরিতানিয়ায় থেকে দ্বীন শিক্ষা করেছেন। উনি কিন্তু সাদা চামড়ার মানুষ – দ্বীন শিক্ষা করার জন্য মরুভূমিতে অত্যন্ত কষ্ট করেছেন। তিনি এই বইতে গসম্যান নামে একজন লেফটেন্যান্টের কিছু গবেষণালব্ধ ফলাফল দিয়েছেন যা আমরা দেখব:

১। টিভির ৪০% সহিংসতা করছে এমন চরিত্র, যাদের মানুষ আদর্শ মনে করে – যেমন, শাহরুখ খান।

২। এই সহিংসতাগুলো যারা করে, তাদের তিন ভাগের এক ভাগ খারাপ চরিত্রের কোন শাস্তি হয় না। এতে বাচ্চারা কী শিখে? আপনি খারাপ কাজ করে বেঁচে যেতে পারবেন। আর আমরা যখন বড় হচ্ছি তখন তো খারাপ কাজ করা হিরোই ছিল – টেলিভিশনে রবিনহুড দেখাত তখন, সে তো ডাকাত ছিল!

৩। টিভিতে যেসব সহিংসতা দেখান হয় তার অর্ধেকের বেশিতে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে – যদি আসলেই কেউ এগুলো বাস্তবে করতে যায়, তবে সে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। পড়েন নাই পেপারে, এসব করতে গিয়ে বাচ্চারা নিজে মরে গেছে বা অন্যকে মেরে ফেলেছে?

৪। ৪০% সহিংসতার ভেতর আবার হাস্যরস থাকে। অর্থাৎ একজন আরেকজনকে মেরে ফেলছে কিন্তু আপনি হাসছেন।

৫। টিভিতে যা দেখান হয় তার মাঝে ৬০% সহিংসতা থাকে এবং ৬০%র বেশি অংশে আক্রমণাত্মক আচরণ থাকে – তবে এটা কিন্তু ১৯৯৯এর কথা। এখন আরও বেশি হবে। বাচ্চারা যদি দিনে দুই ঘন্টা করে কার্টুন দেখে তাহলে বছরে তারা ৫০০ সহিংস আচরণ দেখবে, যা তাদের ভেতর আক্রমণাত্মক ব্যবহারের জন্ম দেবে।

এখানে হামযা ইউসুফ নিজে আরও কিছু ডাটা দিচ্ছেন। আমেরিকায় ১৫- ২০ বছর বয়সী যে সব বাচ্চারা মারা যায় তাদের মৃত্যুর কারণের দ্বিতীয় অবস্থানে আছে 'খুন'। আর আফ্রিকান- আমেরিকানদের মাঝে এটা প্রথম কারণ। আমেরিকায় প্রতি পাঁচ মিনিটে সহিংসতা ঘটানোর জন্য একটা বাচ্চাকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং বন্দুকের ব্যবহার থেকে প্রতি তিন ঘণ্টায় একটা বাচ্চা মারা যায়। আমেরিকায় ৪৮৮১টা সন্ত্রাসী দল আছে যাদের সদস্যের সংখ্যা হচ্ছে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে বড় হওয়া একটা বাচ্চার চেয়ে ওয়াশিংটন ডিসি বা শিকাগোতে বড় হওয়া একটা বাচ্চার খুন হওয়ার সম্ভাবনা ১৫গুণ বেশি। নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের কথা কেন বলছেন উনি? কারণ সেখানে সন্ত্রাসবাদী সংস্থা আই.আর.এ. আছে কিন্তু তাদের আক্রমণে বাচ্চারা মরে না, অথচ আমেরিকায় বাচ্চারা মরছে। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে কিশোর বয়সীদের আত্মহত্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন? ৬০এর দশক থেকেই কিন্তু টিভি এসেছে! এরপর হামযা ইউসুফ বলছেন, দুই লক্ষ সত্তুর হাজার বাচ্চা প্রতিদিন স্কুলে বন্দুক নিয়ে আসে। আমাদের দেশে এরকম হয় না, কিন্তু আমাদের দেশেও কিশোর কিশোরকে মোবাইল ফোনের জন্য হত্যা করেছে। এটা পেপারে উঠেছে। "ওর আছে, আমার নাই!" – এ জন্য মেরে ফেলেছে! আমেরিকায় প্রতি ১৫টা বাচ্চার মাঝে একজনের বাবা অথবা মা কেউ একজন জেলে আছে। এই সব কিছুর পেছনে টিভি বিষয়ক ব্যপারকে দায়ী করা হচ্ছে।

এখন হামযা ইউসুফ যেখানে পড়াশোনা করেছেন, মৌরিতানিয়া, সেখানকার কথা বলছেন। আর সব ইসলামী সমাজের মতো এখানেও মৌখিক সংস্কৃতি বিরাজ করত, অর্থাৎ শোনার মাধ্যমে মুখে মুখে প্রচারের প্রক্রিয়া ছিল; আমাদের কুরআন মুখস্ত করা, হাদীসের বিস্তার এ সবই মৌখিক সংস্কৃতির মাধ্যমেই হয়েছে। আর মুরব্বীদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। আমরা এখন একটা মুরব্বীহীন সমাজে পরিণত হয়েছি। আগে পাড়ার সবচেয়ে অথর্ব বৃদ্ধকে দেখলেও ছেলেরা সিগারেট ফেলে দিত! আর এখন মুরুব্বীর মুখের ওপর ধোঁয়া ছাড়ছে কিশোরেরা। এরপর উনি বলছেন যে, তার পড়াশোনার সময়কালে সেখানে টিভি ছিল না। দশ বছর পর উনি যখন সেখানে আবার গেলেন, তখন আগের দেশটা আর নেই! সেটা অন্যরকম হয়ে গেছে! কেন? যে আতিথেয়তা, মানুষের সাথে কথা বলা – উনি আগে পেয়েছিলেন – সেটা এখন আর নেই। এখন টিভির কারণে মানুষের আর সময় নেই তো, তাই! সেখানে মানুষের সাথে মেলামেশা, কথা বলা নাটকীয়ভাবে কমে গেছে এবং সবার মাঝে কিভাবে আমেরিকায় যাওয়া যায়, বড়লোক হওয়া যায় ও সেখানে গিয়ে টিভিতে যা কিছু দেখায় সব কিনে ফেলা যায় এই তাড়না প্রবল হয়েছে। আমাদের দেশে একই অবস্থা না এখন? একদম একই অবস্থা! আর একটা বিশাল পার্থক্য তিনি দেখেছেন যা হোল টিভির আবির্ভাবের বদৌলতে মানুষের মাঝে "পশ্চিমা আচরণ" বিরাজ করছে – অন্যের জন্য তাদের কাছে সময় কমে গেছে। বাবা, মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ের জন্য মানুষের কাছে এখন আর সময় নেই।

আমরা আজ এখানেই শেষ করছি। আমরা যেন এখান থেকে বোঝার চেষ্টা করি, চিন্তা করি আমরা কী হারিয়ে ফেলছি এবং আমরা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছি। নিঃসন্দেহে টিভি আমাদের মাঝে যা এনে দিচ্ছে তা ইসলামবিরোধী ও অনৈসলামিক জীবনযাত্রা।

প্রতিলিপি লিখেছেন রাবেয়া রাওশিন।

এই লিংক থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন সম্পূর্ণ অডিও লেকচারটি ।